তৃতীয় অধ্যায়

অষ্টগ্রাম হইতে বিদ্যাকূটে

আশ্বিন মাসে ভোলানাথের বাজিতপুর বদলীর কথা হয়। আমাদের অষ্টগ্রাম হইতে বিদ্যাকূট আসা স্থির হয়। বিদ্যাকূট আসিবার সময় মধুবাবুরা আমাদের সঙ্গে ছিল। রাস্তায় সন্ধ্যার সময় একটি বিপদসঙ্কুল জায়গায় আমাদের নৌকা পৌঁছিল। তথায় নাকি খুব ডাকাতের ভয়। রাত্রিতে কেহ এই জায়গায় চলাফেরা করে না। আমরা সেখানে আসিতেই দেখিলাম দূরে একখানি বড় নৌকা, মানুষে ভরা তাহারা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল — তোমরা কোথায় যাইবে ? স্থানের নাম করিলে পর আমাদের মাঝির নিকট হইতে তামাকের আগুন লইবে বলিয়া সে নৌকা তাড়াতাড়ি করিয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। আমাদের নৌকা ও দুই পরিবারের জিনিষপত্র, খুব জোরে চলিতেছিল। দুই পরিবারের লোকজন জিনিষপত্রাদি একই নৌকায়, সঙ্গে কসবা কালীবাড়ীর জন্য একটি পাঁঠা ছিল, সেইটি খুব জোরে ডাকিতেছে। ইহার ডাকেও সকলের ভয় পাছে ডাকাতেরা টের পায়। সামান্য বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু তখন এই অল্প অল্প অন্ধকারের মধ্যে সরু একটি নৌকার রাস্তা একদিকে দেখা গেল। বলিলাম — নৌকা ঐ রাস্তায় চালাইয়া নাও। তাহাই করা হইল। ঐ বড় নৌকাওয়ালারা এই নৌকার উপর যেন লক্ষ্য রাখিতেছিল। সে রাস্তায় অনেক দূর যাইয়া একটি জেলেপাড়া পাওয়া গেল। সেই ঘাটে রাত কাটিল। পরদিন বিদ্যাকূট পৌঁছিলাম। অনেকে ঘটনাটি শুনিয়া বলিল, ঐখানে বর্ষায় বহু ডাকাতি হয়। সকলে খুব বাঁচিয়া আসিয়াছেন। মধুবাবুরা তাহাদের বাড়ী চলিয়া গেল।

সেইদিন মহাষ্টমী ছিল। মা ও বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অন্য ঘরে জ্যাঠাইমাকে (শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজীর বোন) দেখিতে গেলাম। অল্পদিন হয় জ্যাঠামহাশয় মারা গিয়াছেন। এই প্রথম জ্যাঠাইমাকে বিধবা দেখিলাম। একটু চুপ করিয়া থাকিতেই জ্যাঠাইমা হাসিয়া বলিল — বুড়া মানুষ মরিবে না ? পরে দেখিলাম

এত তীব্র আকর্ষণ এই শরীরটার উপর হইয়া গেল যে জ্যাঠাইমা তাহার সুখদুঃখের সকল কথা এই শরীরের কাছে বলিতেন। এই শরীরকে খুব আদরও করিতেন। ইনিই কৃষ্ণের শতনাম এই শরীরের নিকট হইতে আগ্রহ করিয়া মুখে মুখে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার চিঠিপত্র লিখাইতে হইলে এই শরীরকেই ডাকাইতেন। এ শরীরের লেখা ভুল হইত ও ভাল হইত না। তাঁহার চিঠি লিখিতে লিখিতে লেখাগুলি পরিষ্কার হইয়াছিল এবং তাড়াতাড়ি লিখিতে অভ্যাস হইয়াছিল কিন্তু অশুদ্ধ থাকিয়া যাইত। তাঁহার ঘরে যদি কাহারো সঙ্গে ঝগড়া হইত, আমাকে সব ভাঙ্গিয়া বলিত। অপর পক্ষ আসিয়াও এই শরীরকে সব জানাইত।

একদিন জ্যাঠাইমা জানিতে পারিলেন যে আমার কাছে কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলে। ইহা শুনিয়া জ্যাঠাইমা অপর একজনকে বলিল — আমি অবাক হইলাম এই মেয়ে সকলের কথা শোনে অথচ কাহারও কথা কাহারও কাছে বলে না। কেমন করিয়া নির্বিকার ভাবে সব শোনে আশ্চর্যের বিষয়। উহার কাছে কথা বলা আর কুয়ায় ফেলা একই কথা। পরে কাশীতে তাহার দেহত্যাগ হয়।

তখন সাধারণ গ্রাম্য ভাবে কৃচিৎ কখনও সৎকথা, ধর্ম-প্রসঙ্গাদি জাগতিক হিসাবে যতটুকু শোনা, আর খেয়ালে যতটুকু আসা তাহা মুখ দিয়া বাহির হইত এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা হইত। সব রকম বয়সের লোকদেরই এই শরীরের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহারটা ছিল। সে সময় কখনও কখনও কি এক বিহ্বল ভাব প্রকাশ হইত। যাহা বলিতাম সকলে মনযোগের সহিত শুনিত আর বলিত — তোমার মুখে এইসব কথা শুনিতে যে কি আনন্দ পাই তাহা আর কি বলিব। ছোট মেয়েরাও কথা শুনিতে ভালবাসিত। এই শরীরের যখন যাহা খেয়ালে আসিত, তাহাই বলিত। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয় এই শরীরের কোন দিন হইত না। উপস্থিত যখন যেমন হইয়া যাইত।

বিদ্যাকূটে আমি নাম করিতে বসিতাম না। কেননা বসিলেই শরীর অন্য রকম হইয়া যাইত। কখন কখন বহুদূর হইতে কীর্তনের শব্দ কানে আসিলে বা নিকটে কোথাও কীর্তন হইলে শরীরের অবস্থা বুঝিয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িতাম। সুতরাং বাহিরে কাহারো নিকট

বিশেষ প্রকাশ পাইত না। অষ্টগ্রামেই যাহা এই সব সম্বন্ধে প্রকাশ হইয়াছিল। নতুবা ভোলানাথ ব্যতীত আর কেহ জানিত না। মা-বাবার কাছেও এই সব কথা বলিবার খেয়াল হয় নাই।

আর একদিন অন্য প্রশ্নের উত্তরে মা বলিতে লাগিলেন, কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় উঠানে হাঁটিয়া নাম করিতে থাকিলে দেখিতাম শরীর রোমাঞ্চিত হইত এবং বাম চোখের কিনারায় একটি আলো দেখা যাইত। যতক্ষণ নাম হইত শরীর ঢুলু ঢুলু ভাবে মহানন্দে ভরপুর থাকিত এবং ঐ আলোটি বড় নয়, অনেকটা নক্ষত্রের মত। যতক্ষণ নাম করিতাম ততক্ষণই উহা থাকিত, নাম বন্ধ করিলে উহা আর দেখা যাইত না। প্রশ্ন — ইহার কারণ কি? উত্তরে মা — নাম, মন্ত্র, জ্যোতি, তাঁহারই রূপ। আরে! ঐ জ্যোতি তাঁহারই রূপ।

শরীরের মা মাখনের কল্যাণে মাসে মাসে হরির লুট দিত। একদিন ছোট ছোট চার পাঁচটি ছেলে ঠাকুর ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া হরিনাম করিতেছে। এমন সময় দেখি শরীর অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। নাম থামিবার অনেক পরে স্বাভাবিক হইল।

গ্রামে কলেরা লাগায় বাড়ী বাড়ী সকলে মিলিয়া কীর্তন করিতেছিল। সে কীর্তন পিত্রালয়ে আসিলে সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং নামের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। সময় কম বলিয়া তাহারা অন্যত্র চলিয়া গেল, নতুবা এ শরীরের তখন অষ্টগ্রামের মত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আরও দুইদিন বাড়ীতে কীর্তন হইল। সকলে শুনিতে কীর্তনের কাছে গেল, এই শরীরটা অন্ধকার ঘরের ভিতর গড়াইয়া পড়িল। আগেকার মত শরীরের ভাবাদিও অনেকটা হইয়াছিল। নিকটে কেহ ছিল না, তাই ভাল হইল কেহ জানিতে পারিল না। কেহ না জানিতে পারে এই খেয়ালটা সর্বদা আপনিই থাকিত। কোন কোন সময় বাহিরে দেখিতে শরীর অস্বাভাবিক বা তন্দ্রাভাবে জড়িত এইরূপ প্রকাশ পাইত। সাধারণতঃ তখন সকলে অসুস্থ বলিয়া মনে করিত।

একদিন অনেক রাত্রে বহুদূরে খোল করতালের ধ্বনি ও নাম শুনিলাম। শরীরের পূর্ববৎ অবস্থাদি হইল। ঘর অন্ধকার ছিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইতে শরীরটা ধীরে ধীরে শান্ত হইল। মা ইতিমধ্যে একবার বাহিরে যাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু শরীরের

ভাবের জন্য উত্তর দিতে পারি নাই। দেখা যাইত, শরীরের এ অবস্থাদি কেহ না জানুক এইরূপ ভাব আসিলেই এ শরীর সকলের কাছ হইতে আলগা হইয়া সরিয়া যাইত এবং যেইরূপেই হউক ইহার সুযোগ হইয়া পড়িত।

এ শরীর ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গেও খেলাধূলা করিত। এইজন্য অনেক সময় সমবয়সীরা বা বয়স্করা বলিত — তোর যেন বয়স হয় নাই, এত ছোটদের সঙ্গে তোর কেমন করিয়া খেলার প্রবৃত্তি আসে?

পাড়ার বা গ্রামের সকলেই এই শরীরকে ভালবাসিত। বৌ, ঝি ও প্রাচীনারা অনেকক্ষণ না দেখিলে অভাব বোধ করিত। একবার পাইলে ছাড়িতে চাহিত না। বৌ-এরা বাপের বাড়ী যাইবার সময় বলিত — আপনাকে সেখানে ত পাইব না, তাই যাইবার আনন্দ ভোগ করিতে পারিতেছি না। যখন বিদ্যাকূট হইতে চলিয়া আসিতাম, তখন পাড়ার কেহ কেহ দৌড়িয়া আসিত ও বলিত — বাঁচিয়া থাকিলে আবার তোমাকে দেখিব। মুসলমান প্রতিবেশীরাও কান্নাকাটি করিত। দেখিতাম দেশ বিদেশে রাস্তা ঘাটে যেখানে যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত হিন্দু বা অন্য জাতি হউক সকলেই এ শরীরটাকে স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিত, আবার কবে দেখা হইবে জানিতে চাহিত। তাহারা এ শরীরকে ভুলিতে পারিত না, এ শরীরও তাহাদিগকে ভুলিবে না বলিত। কেহ এ শরীরকে পর ভাবিলে কান্নার প্রভাব দেখা যাইত। এইরূপ অনেক ঘটনা হইয়াছে যাহাতে ঘরের কি বাহিরের লোক হউক এই শরীরকে আপন বলিয়া মনে না করিলে এ শরীর তাহাদেরই একজন ইহা জানাইবার জন্য ভাবে ও ব্যবহারে কেমন যেন একটা ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত।

একদিন দাদা সম্পর্কীয় বাবার এক জ্ঞাতি এ শরীরকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। নিমন্ত্রণ অসময়ে হইয়াছিল। আমি সে বাড়ী গেলে দাদা আমাকে বলিলেন — নাতিন! আমার ত্রুটি হইয়াছে বড় অসময়ে ডাকিয়াছি। আমি বলিলাম — আপনি একেবারে পর ভাবেন কিনা, সেজন্য এ কথা বলিতেছেন। আমি ত জানি আপনি আমাকে আপনার মেয়ের মত খাইতে বসিয়া ডাকিলেও আমি আসিব ও খাইব। তিনি এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত কিছু দেখিতে পাইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন — যেমন দেবী মূর্তিটি, তেমন ভাব ও কথা।

কোন কোন সময় আপনা হইতে অস্বাভাবিক ভাবাদি আসিয়া পড়িত। সেদিনও কথা বলিতে বলিতে ক্ষণিকের জন্য তাহাই হইয়াছিল।

পাশের বাড়ীতে এক বয়স্ক কাকা (স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য) ছিলেন। তিনি ছুটির দিনে বাড়ী আসিলে আমাকে নিকটে না পাইলে তাঁহার ভাল লাগিত না বলিতেন। কোন কোন সময় তাঁহার সংসারের যাবতীয় বিষয় এ শরীরকে বলিতেন। সুন্তানের বয়স্কার সঙ্গে এইসব দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী ও মা আনন্দে অবাক হইতেন।

আর এক বাড়ীতে বয়স্কা দিদি ছিল। এ শরীরকে খুব স্নেহ করিত। তাঁহার ছেলে বিদেশে থাকিত। আমি সে বাড়ীতে প্রায় সময়ই একা চুপ করিয়া বসিয়া শুইয়া থাকিতাম। কৃচিৎ কোনদিন নাম করিবার ভাব আসিলে ওখানেই বসিতাম। মাঝে মাঝে তাহার চিঠিপত্রও লিখিয়া দিতাম। ভোলানাথের পত্রের জবাব দিতে হইলে সেখানে বসিয়া এক এক লাইন বা কোন সময়ে বেশী লিখিয়া ২।৩ দিনে একখানি চিঠি শেষ হইত। ভোলানাথ কত কি লিখিতেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া যেন এ সবের কোন উত্তর আসিত না।

একটি বউ, সে বয়সে আমার অল্প বড় হইবে, আরেক বাড়ীতে ছিল। এ শরীরের সঙ্গে তাহার খুব ভাব ছিল। এক সঙ্গে গান গাওয়া, এক সঙ্গে খেলা এইরূপে প্রায় সারাদিন কাটিত। ব্যবহারিক জগতের কোন কথাই তাহার ও আমার ভিতর প্রায় অজানা ছিল না। যাহার সঙ্গে মিশিতাম তাহার নিকট ভাবে বা ব্যবহারে সামান্য এক অক্ষরও আড়াল থাকিলে গোপন হয়, এইরূপ ভাব থাকিত। একদিন কোন এক ঘটনায় দেখিলাম সে আমাকে প্রায় খুলিয়া সব বিষয় বলিতে চাহে না। একসঙ্গে সরলতা ও কুটিলতার খেলা কেমন চলিতে পারে সেদিন বেশ বাহিরে এ প্রকাশটা তাহার দেখা গেল। সে যাহা করুক তাহার প্রতি এ শরীরের ভাব এক রকমই রহিল। শিশু বয়স হইতেই সত্যনিষ্ঠার উপর খেয়াল ছিল। সত্য কথা বলা, সত্য ব্যবহার করা, সত্য প্রতিপালন করা মায়ের আদেশও ছিল। চাল চলন সর্বদাই সোজাসুজি ছিল। কোথাও হয়ত কেহ চুপি চুপি কিছু বলিতেছে বা করিতেছে সে সম্বন্ধে পূর্বে কাহারো মুখে কিছু না জানিয়া শুনিয়া এ শরীর হঠাৎ তথায় গিয়া পড়িয়াছে। তাহারা ভাবিল চালাকির সহিত গিয়াছে। কাহারও ইহাতে দোষ নাই।

কারণ কেহ ধারণা করিতে পারিত না যে এ শরীরের আপনা হইতেই স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ হইয়া যায়।

সত্য ঘটনার প্রকাশ

প্রায় পনের বৎসর পূর্বে ঐ জ্যাঠাইমার ঘর হইতে নাকি কিছু অলংকার চুরি যায়। সে বাড়ীতে তাহাদের একটি জ্ঞাতির ছেলে সর্বদা আসা যাওয়া করিত। ছেলেটিকে তাহারা ভালবাসিত। চুরি হইবার পর সকলে তাহাকেই চোর বলিয়া সন্দেহ করিল এবং বাড়ী হইতে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। এ শরীর যখন বিদ্যাকূটে, সে সময় বাস্তবিক যাহারা চুরি করিয়াছিল তাহাদের একটি মেয়ে আসিয়া এ শরীরকে আপনা আপনিই কথায় কথায় বলিতে লাগিল যে তাহার দিদির এই এই গয়না বাপের বাড়ীতে আছে। জ্যাঠাইমার জিনিষ চুরি হইয়াছিল, সেও তখন আমার নিকটই বসা ছিল। সে আমাকে দুঃখের সহিত পরে জানাইল যে আজ ১৫ বৎসর পর তোর সম্মুখে সত্য খবর বাহির হইল। এখন জানিতে পারিলাম জিনিষগুলি কে চুরি করিয়াছিল। ছেলেটি কত কান্নাকাটি করিয়া বলিয়াছিল যে সে কিছুই জানে না। এই দুঃখে সে পাগল হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণ তোর কাছে সত্য আলোচনা হইতেছিল কিনা, কাজেই ভগবান সত্য প্রকাশ করিয়া এতদিনের পর একজনের উপর আমাদের মিথ্যা সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন। আমি পূর্বে ঐ ঘটনা কাহারও মুখে শুনি নাই। মেয়েটি আমাকে বলিতেই ঐ সম্বন্ধে আভাস পাইয়া দেখিতেছিলাম জ্যাঠাইমা ঐ জিনিষ সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ নিতেছিলেন।

ছোটবেলায় মা বলিয়াছিলেন পুরুষের চোখ মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে নাই। ভোলানাথও এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। কোন পুরুষ এমনকি বাপ ভাই-এর মুখের দিকেও তাকাইতাম না। বেশী কথা বলা বা অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করাও অভ্যাস ছিল না। ঠাট্টা তামাসা এ শরীরের খেয়ালে আসিত না। কিন্তু আবার কোন কোন সময়ে কেমন একটা অস্বাভাবিকভাবে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত হইয়া যাইত।

একদিন বড় জ্যেঠতুত ভাই, নাম ৺উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য হাতে কি কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার হাতও পরিষ্কার নয়। তিনি খুব

পান খাইতেন। আমার নিকট হইতে পান চাহিয়া তাঁহার মুখে দিতে বলিলেন। আমার খেয়াল হইল পুরুষের মুখের দিকে ত চাহি না, কেমন করিয়া দিব ? তৎক্ষণাৎ খেয়াল হইল কেবল পানটা দিবার জন্যাই পানটাতে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার মুখে দিব এবং তাহাই করিলাম। ভোলানাথকেও তাহা জানাইলাম।

এক বিবাহ উপলক্ষ্যে

বাবার এক জ্ঞাতির বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষ্যে অনেক লোকজন আসে। তাহার ভিতর এ শরীরের সম্পর্কে ঠাকুরদাদা হয় এমন দুইজন যুবকও ছিল। এ শরীর সেখানে গেলে উহাদের একজন নানা বিদ্রূপ করিল, আর একজন নতুন বৌয়ের মুখ চিনি দিয়া দেখিতেছিল, সে সময় এ শরীরের মুখেও চিনি দিতে আসে। এ শরীর চুপ করিয়া সরিয়া যায়, কিন্তু দুইজনার উপর হঠাৎ কেমন একটা তীব্র দৃষ্টি বিদ্যুতের মত প্রকাশ হইয়া পড়িল। তোমাদের এ ইচ্ছার যে দৃষ্টি, এমন নয়, তাহাদের ক্রিয়ায় দৃষ্টিটা ঐরূপ হইয়া গিয়াছিল। বিবাহের পরে তাহারা নিজ বাড়ী চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে শুনিলাম যে চিনি খাওয়াইতে চাহিয়াছিল সে মারা গিয়াছে, আর একজনকে কি এক সামান্য কারণে অন্য লোক ধরিয়া মারপিট করিয়াছে।

আমার উপর কাহার কিরূপ ভাব আমি বুঝিলেও মুখে বা ব্যবহারে তাহা প্রকাশ হইত না। নিজেই হাসিতাম। দেখিতাম যদি কেহ এ শরীরের সঙ্গে বিরুদ্ধ আচরণ করিত, সে পরে নিজে আপনা আপনিই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত।

অন্য বাড়ীর একভাই-এর বিবাহে বৌ-এর সঙ্গে তাহার দুই ভাই আসিয়াছিল। ভোলানাথও সেখানে ছিলেন। দেশের প্রথানুযায়ী ঠাট্টার পাত্র বলিয়া ভোলানাথকে ও আমাকে তাহারা ঠাট্টা করে দেখিয়া ভোলানাথ বলিলেন — উহাদিগকে খুব জব্দ কর। সেইদিন কেমন অস্বাভাবিক ভাবের সহিত নানা রকমে তাহাদিগকে নাকাল করিয়াছিলাম। শত চেষ্টায় তাহারা এ শরীরের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। কেবল বলিতে লাগিল — উনি ভয়ানক চালাক। এমন আর দেখি নাই। পরে একদিন নূতন বৌটি বলিল — আমার বাপের বাড়ীর সকলে বলে আপনি নাকি বড় চতুরা।

উপরোক্ত ভাইএর বিবাহে সে বাড়ীর বড় বৌ রান্না করিবে এবং এ শরীরকে সাহায্য করিতে হইবে, সে নিজে আসিয়া বলিয়া গেল। সে ভাল রান্না করিতে পারে বলিয়া সুনাম আছে। যথা সময়ে সেখানে যাওয়া হইল, কোন কাজে হাত না দিতেই সে এ শরীরকে বলে — আপনি যান, আমিই পারিব। এ শরীরের মা তথায় ছিলেন, তিনি বলিলেন — যখন যাইতে বলিতেছে তুই যা, যাহা দরকার হয় আমিই করিব। তাহাকে বলা হইল — বেলা হইয়াছে আমরা দুইজনে রান্না শেষ করিয়া দিই। কিন্তু সে কিছুতেই দিল না। সে রান্না করে আর এ শরীরের এক খুড়িমাকে চাখায় কেমন হইয়াছে। এ শরীর চলিয়া আসিল। পরে খাইতে বসিয়া দেখিলাম কোন তরকারী ভাল হয় নাই। আমি বলাতে তাহার বিশ্বাস হইল না আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল সেও বলিল — নুন কম, পান্‌সা লাগে। আপনি এত ভাল রান্না করেন আজ কেন কেমন হইল ? সেইদিন রান্না খারাপ হইয়াছিল বলিয়া সে মনে বড় দুঃখ পাইয়াছিল। দুঃখে অপমানে তাহার ফিট হইয়াছিল, পরে কেহ কেহ বলিল, তোকে ডাকিয়া আনিয়া সরাইয়া দিল, নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য এখন পাক কেমন হইল ?

পাড়ায় এক বৃদ্ধ জ্যাঠামহাশয় ছিলেন নাম বিহারী ভট্টাচার্য। তিনি গীতা ও ধর্মগ্রন্থাদির চর্চা নিয়া বাড়ীতে অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। তাঁহার সাত আটটি ছেলেমেয়ে ছিল। এ শরীর যখন বিদ্যাকূটে থাকিত তাঁহার কোন কাজে ছেলেমেয়েকে না ডাকিয়া এ শরীরকে ডাকিতেন, আর এ শরীর যাহা করিয়া দিত তাহাতেই আনন্দ পাইতেন। তাহাদের বাড়ীর লোকগুলিও এ শরীরকে ভালবাসিত ও বলিত — তুই চলিয়া গেলে আমাদের তো দুঃখ হয়ই তোর জ্যাঠার আরো বেশী হয়। নিজের মেয়েরা শ্বশুর বাড়ীতে গেলে ত কিছুই দেখি না।

বিগ্রহ-স্পর্শ লীলা

এই শরীরের যাহা খেয়ালে উঠিত তাহা যে কোন উপায়ে সম্পাদিত হইত। একবার সীতারামের মূর্তি, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি এবং আরও অন্যান্য দেবালয়ের স্থাপিত মূর্তি ছুঁইবার খেয়াল হইয়াছিল।

সকলের অজ্ঞাতসারে বাধা বিঘ্নের মধ্যে সহজভাবে মুহূর্তের মধ্যে স্পর্শটি হইয়া গিয়াছিল। আরেকবার দুর্গামোহন ভট্টাচার্য নামক বাবার এক জ্ঞাতির বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময় নিমন্ত্রণ করিয়াছে। দুর্গামন্দিরে যাইয়া দেবীকে স্পর্শ করিবার জন্য কি এক ঝোঁক চাপিল। সেখানে নানা রকমের লোক, পাহারা ইত্যাদি, কেমন করিয়া যাওয়া যায়। কোনদিন সে মণ্ডপে যাওয়াও হয় নাই। যাহা হউক, কি এক অস্বাভাবিক ভাবে সে বাড়ী গিয়া ঠিকমত মণ্ডপে পৌঁছিলাম এবং সকলের অজান্তে দেবীমূর্তি ছুঁইয়া চলিয়া আসিলাম।

কেহ অসুস্থ হইলে কোন কোন সময় খেয়ালে আসিত এ শরীর ছুঁইলে ও দেখিলে রোগী ভাল হইবে। কার্যতঃ সুফল হইত। সুফল যখন না হইবার হইত, তখন আবার ছুঁইবার ভাবও আসিত না। অথবা সে কাজে কোন না কোন প্রতিবন্ধক রূপটা প্রকাশিত হইত।

ধর্মনিষ্ঠদের সহিত যোগসূত্র

পুরুষ, স্ত্রী, ছোট বড় যে কেহ হউক না কেন কাহারও যদি ধর্ম ভাব দেখিতাম, নিয়মিত সন্ধ্যা বন্দনাদি করে, ভগবানে মন জানিতাম — তাহাদের উপরও কোন কোন সময় স্বতঃই একটা বিশেষ ভাবের প্রকাশ ফুটিয়া উঠিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, বিদ্যাকুটে কয়েকজন ধর্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন। বিজলীর স্পর্শ যেমন, তাহাদের কাহাকেও দেখিলে শরীর সেইরূপ হইত। দেখিতে পাইতাম যে উহারা আন্তরিক ভাবে বিশেষ উন্নত হইতেছেন। সে সময় এই শরীরের দিকেও তাহাদের লক্ষ্য থাকিত। সে অবস্থায় আমি সরিয়া থাকিলেও তাহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ সুক্ষ্ম ভাবটা স্পষ্ট থাকিত। বিশেষ কথা এই যে এই সব ধর্মনিষ্ঠ স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই এ শরীরের উপর বিশেষ আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও কাছে আসা, কথা বলা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে ত করিতে পারিত না। অপরের বাড়ীর বিবাহিতা যুবতী মেয়ে, পুরুষদের জাগতিক দৃষ্টিতে ত অনীতি। কিন্তু এ শরীরের প্রতি এই যে বিশুদ্ধ আকর্ষণ এবং শ্রদ্ধা উদ্দীপক ভাব ইহাও তাহারা সম্যক বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিত না। এ শরীর কিন্তু তাহাদের ভিতরের বিশুদ্ধ ভাবগুলির খেলা দেখিয়া যাইত। তাহাদের অজ্ঞাত ভাবেও ইহা ধর্ম পথের বিশেষ অনুকূলই হইত।

কসবা কালী দর্শন

বিদ্যাকূট আসিবার পর কসবা কালীবাড়ী গিয়াছিলাম। খেওড়া রাস্তায় পড়ে বাবার মামাবাড়ী। শ্রীশদাদার বাড়ীতে এই শরীরের ঠাকুরমার সই চিক্কনদিদি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল — এতদিন পর দেখিয়াছি, তাই আনন্দে আমার কান্না আসিতেছে। সে প্রায় সমস্ত রাত কাঁদিল ও মনের কত কথা বলিল। কিন্তু এ শরীর হাসিতেছে। পরদিন কসবা গেলাম, দেখি দূর সম্পর্কীয় এক কাকাও ছিল, খুব ধার্মিক। কালীবাড়ী যাইয়া সকলের সাথে প্রণাম করিতে কি রকম হইয়া গিয়াছিলাম। মা ও কাকা ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহারা ভাবিয়াছিল যে ছেলেপিলের জন্য বুঝি কালীর কাছে প্রার্থনা করিতে যাইয়া এইরূপ ভাবের পরিবর্তন হইয়াছিল। এই শরীরের যে এইসব দিকই নাই তাহারা তাহা জানে না।

ডাকপিওন হরিশ

৫/৬ বৎসর বয়সে মামাবাড়ী ছিলাম। সে বাড়ীতে স্থানীয় ডাকপিওনটা থাকিত। তাহার নাম ছিল হরিশ। জাতিতে সে শূদ্র। তাহার ভিতর খুব ভাল লক্ষণ দেখা যাইত। দেখিলেই বড় আপন লোক বলিয়া ব্যবহার করিত। তাহার স্বভাবও বড় সুন্দর ও সরল ছিল। মাটির দিকে তাকাইয়া কথাবার্তা বলিত। সকলের মুখেই তাহার প্রশংসা ছিল। এ শরীর অষ্টগ্রাম হইতে বিদ্যাকূট আসিয়া দেখে সে তখন সেখানকার ডাকপিওন। অনেকদিন পর দেখিয়া তাহার খুব আনন্দ হইল। রাত্রিতে কোন জিনিষের উপর টর্চ লাইট পড়িলে তাহা যেমন উজ্জ্বল পরিষ্কার দেখা যায়, সেইরূপ তাহার উপর এই শরীরের যখন এক রকম দৃষ্টি পড়িত, দেখিতাম সে বদলাইয়া উন্নত হইতেছে। তাহার ভিতর অসাধারণত্ব রহিয়াছে, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইত। এ শরীর যখন ছোট্ট, এই হরিশ এ শরীরের মামাবাড়ীর গ্রামে ডাকপিওন ছিল। এ শরীরকে সে কখনও কখনও কোলে কাঁধে করিত। পরে যখন বীরভূম যাই (১৯৩২ ইং), কথায় কথায় শুনিলাম তাহার সাধনার এত ফল হইয়াছিল যে সে

সমাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছে। অনেক লোক তাহার কৃপা পাইয়াছিল। এখন তাহার স্ত্রী ঐ সমাধিস্থানে বসিয়া সাধন ভজন করিতেছে।

বিদ্যাকূট হইতে আটপাড়ায়

প্রায় ৩ বৎসর পর ভোলানাথ বিদ্যাকূটে আসিলেন। ঠিক হইল যেদিন তিনি বাজিতপুরে যাইবেন সেইদিন বাবা আমাকে নিয়া আটপাড়া যাইবেন। ক্রমে আটপাড়া যাওয়ার দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। বাড়ী ও পাড়ার সকলেই দুঃখিত। যাওয়ার দিনের পূর্ব হইতে এ শরীরও সকলের মধ্যে গম্ভীর হইয়া গেল। দীর্ঘদিন বিদ্যাকূট থাকায় — ছাড়াছাড়ি সকলের বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছিল। ধর্মভাবের ভাবটা সৎসঙ্গের মত আপনা আপনিই যেন ঐ সময় সকলের মধ্যে চলিতেছিল। সৎসঙ্গ কাহাকে বলে কেহ কিন্তু জানিত না, বুঝিতও না। এ শরীরের যখন যাহা হয় তাহা সীমা অতিক্রম করে। সমস্ত শরীর অবশ, যেন আর চলে না। বাড়ী হইতে কোন মতে নৌকায় যাইয়া স্টীমারে উঠিয়া বসিয়া আছি। দেখি কি — আমি বিদ্যাকূটের বাড়ীতে আছি। মা ও পাড়া-পড়শীর উদাস ভাবের মধ্যে মিলিয়া রহিয়াছি। তারপর নেশাখোরের মত শুইয়া পড়িলাম। পরে শোনা গেল পাড়া প্রতিবেশীদেরও নাকি এ জাতীয় ঘটনায় — এমন ছট্‌ফটানি পূর্বে আর হয় নাই।

পাড়ার মুসলমানের মেয়েরা অবধি সঙ্গে সঙ্গে কতক দূর আসিত ও কান্নাকাটি করিত। যখন যে ভাবটি খেলিত তাহা এমন করিয়া আঁকড়াইয়া প্রকাশ হইত যে সর্ব শরীর যেন সেই ভাবে। রাত্রে স্টীমার স্টেশনে নামিয়া এক পরিচিত বাড়ীতে গিয়া রহিলাম। পরের দিন একটি কুলি ও একটি ডুলি করা হইল। কুলির সঙ্গে সঙ্গে বাবা রহিলেন। কুলি হাঁটিতে পারে না, বিশ্রাম করিয়া করিয়া আসিতেছে। ডুলিওয়ালা আগে আগে আসিয়া আমাকে নিয়া এক বাগানের ভিতরের রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। আমি দাঁড়াইতে বলিলাম — শোনে না। পরে তাহারা রাস্তা ঠিক করিতে পারে না, ডুলি নামাইয়া বসিয়া পড়িল। সরু সরু তিন পথ। উহার ভিতর আমি একটা দেখাইয়া বলিলাম — এই রাস্তায় যাও, কাহাকেও পাইলে এইখানে নিয়া

আসিও। একজন গিয়া একটি লোক নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করে এই ডুলি কোথায় যাইবে ? আওয়াজে বুঝিলাম ভদ্রলোক। অথচ আমি বউ। গ্রামের লোকের সঙ্গে কি করিয়া কথা বলি। আমি কি করিলাম, ডুলির ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া রাস্তায় মাটিতে ভোলানাথের বড় ভাইয়ের নাম লিখিয়া দিলাম। সে আমাকে নিয়া সেই বাড়ী গেল। পিতা অনেক পরে কুলিকে নিয়া আসিলেন।

এ শরীর তখনকার মত সে বাড়ীতে ছোট বলিয়া সংসারের সব কাজ একাই করিত। আশুর মা যদি কোন কারণে কোন কাজ করিত তবে খেয়াল হইত উহা আমারই করা কর্তব্য ছিল। কাজের দিকে এইরূপ খেয়াল থাকায় শরীরের প্রতি একেবারেই লক্ষ্য পড়িত না। বাড়ীতে আশুর মা, আশুর দাদা, আশু ও তাহার এক বোন ও আমি ছিলাম। গ্রামের বউয়েরা ঘোমটা ইত্যাদি যে নিয়মে রাখে, এ শরীর সে ভাবে আরো খেয়াল করিয়া চলাফেরা করিত। কোন কোন সময় এক কাজ করিতে গিয়া অন্য কাজে একটু দেরী হইলে, কেহ কিছু বলিলেও এ শরীর আনন্দে গ্রহণ করিত। তখন বর্ষাকাল। সময় সময় বৃষ্টিতে ভিজিয়াও কাজ করিতাম। এ কারণে ঠাণ্ডায় টন্‌সিল ফুলিয়া জ্বর হইল। অসুখ এত বাড়িয়া গেল যে দুধ বার্লি খাওয়াও কষ্টকর। ঔষধের ব্যবস্থা হইল। সকলে খুব যত্ন করিল। ভোলানাথও বাজিতপুর হইতে আসিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে অসুখ সারিয়া উঠিতে লাগিল।

ইহার ভিতর একদিন পাশের বাড়ীতে কীর্তন হয়। তখন এ শরীরে অবশ হইবার মত অবস্থাদি হয়। এ শরীর তখনো বিছানায়। সকলে ভাবিল অসুস্থতায় বোধ হয় নূতন উপসর্গ। পরে বাড়ীতে একদিন ছেলেরা হরিলুট দিল। সেইদিনও ঐ রকম অবস্থা হইল। বাড়ীতে ইতিমধ্যে একদিন চুরি হইয়া যায়, এ কারণে সকলের বাজিতপুর যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া ভোলানাথ চলিয়া গেলেন।

প্রতিবেশীগণের সেবা

নিকটস্থ শূদ্র বাড়ীর দুই তিনটি মেয়ে এ শরীরের জন্য খুব করিত। অসুখ হইতে অল্পদিন উঠিয়াছি। ভোরে উঠিয়া কাজ

করিলে ঠাণ্ডা লাগিবে, এই ভাবিয়া খুব সকালে আসিয়া আমার কাজগুলি — বাসনমাজা ইত্যাদি — ইহারা গোপনে করিয়া যাইত। কোন কোন সময় ভাল আম পাইলে আমার জন্য রাখিয়া দিত। সময় মত আপন হাতে ক্ষীর বানাইয়া, মুড়ি চিনি সব জোগাড় করিয়া আমাকে চুপি চুপি ডাকিয়া নিয়া খাওয়ার জন্য হাতে পায়ে ধরিত। অগত্যা না পারিয়া সামান্য কিছু খাইয়া অবশিষ্ট এক সঙ্গে মিলাইয়া তাহাদের হাতে দিতাম।

তাহারা খুব গরীব ছিল। কোন সময় আমার মাথা ও চুল পরিষ্কার করিয়া দিত, কাপড় কাচিয়া দিত। বলিত — না আছে তোমার শরীরের খেয়াল, না আছে খাওয়ার দিকে খেয়াল। কেবল ২৪ ঘণ্টাই কাজ। আমি যদি কোন সময় বলিতাম — আমি ত তোমাদের জন্য কিছু করিতে পারি না, তোমরা আসিয়া এই শরীরের জন্য এত কর, তাহারা বলিত, তুমি যে আমাদের সঙ্গে হাসিয়া কথা কও, ইহাতেই আমাদের আনন্দ। যেইদিন শুনিতাম তাহাদের খাওয়া হয় নাই, সেইদিন রক্ষিত মুষ্টি-চাউল হইতে, তাহাদিগকে কিছু দিতাম। আর আমি খাইতে বসিলে তাহারা যদি আসিত, কিছু খাইয়া থালাটি দিয়া দিতাম।

বাজিতপুরে মা

আষাঢ় মাসে আমরা বাজিতপুরে চলিয়া গেলাম। বাজিতপুরে আশুর মা কাছারীর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট-এর স্ত্রীকে দিদি ডাকিত। আমিও তাহাই একদিন বলিতে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট-এর মেয়ে উষা* বলিল — না, তাহা হইবে না, আপনি মাকে অন্য কিছু ডাকুন। আমরা আপনাকে দিদি বলিয়া ডাকিব। আমি সেইদিন হইতে তাহার মাকে মাসিমা বলিতাম। উষাকে দিদি ডাকিতাম। উষাদিদির বাবা ঢাকা বদলী হইয়াছিল। উষাদি বাজিতপুর হইতেই তাহার শ্বশুরবাড়ী গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল — দেখিব দিদি তোমার কেমন টান, শীঘ্র যেন দেখা হয়। উষাদিদির মা ও তাহাদের

* নবাব ষ্টেটের, রাসবিহারী দত্তের মেয়ে : স্বামী, জানকীনাথ গুহ।

বাসার সকলে এ শরীরকে খুব ভালবাসিত ও নাম ধরিয়া ডাকিত। উষাদিদির মা একদিন বলিল — প্রথম যখন তোমাকে ঘাট হইতে স্নান করিয়া যাইতে দেখি, তখন আমার মনে হইয়াছিল — বোধ হয় কোন বড় লোকের বৌ বা মেয়ে হইবে।

আশ্বিন মাসে যে তুমুল ঝড় বৃষ্টি (cyclone) হইয়াছিল, সে রাত্রে ইহার ভিতর এ শরীর ঘরে বসিয়া আপনভাবে নাম করিতে-ছিল। ভোলানাথ ঘরে আসিয়া ডাকিল। নাম করিতেছিলাম, তাহা হইতে উঠাইল — দেখিলাম ঘরখানি নড়িতেছে। বলিলাম তবে চল অন্য ঘরে যাই, এ বলিয়া আমরা বাহির হইতে তখনই ঘরখানি পড়িয়া গেল। ঝড় বেশী হইতে লাগিল দেখিয়া আমরা নিজেদের বাসা ছাড়িয়া অন্য এক বাসায় চলিয়া গেলাম। পরে দেখিলাম পাড়ার অনেক ঘরই ভূমিসাৎ হইয়াছে! কয়েকদিন পর আশুর মা তাহার দেশের বাড়ী আটপাড়ায় চলিয়া গেল। আশু আমাদের নিকটই রহিল।

তুলসীমালা পরিবার উপদেশ

একদিন বাসায় কয়েকজন মিলিয়া কীর্তন করিতেছে। পূর্বের মত অবস্থাদি হইয়া এ শরীর মাটিতে পড়িয়া গেল। ভোলানাথ আসিয়া দেখিলেন। ক্রমে ক্রমে বহুক্ষণ পরে এ শরীর প্রকৃতিস্থ হইল। প্রায় তিন বছর পর এ সব ভাবাদি আবার দেখিয়া ভোলানাথ চিন্তিত হইলেন। বৈষ্ণব ও ভক্ত এক মুনসেফ বাজিতপুরে ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে অহোরাত্র কীর্তন করাইতেন এবং নিজেও নাম করিতেন। ভোলানাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন — এই সব ত খুব ভাল। তবে তাঁহাকে গলায় তুলসী মালা পরিতে বলুন। এই কথা শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম — মালা বাহিরে, না ভিতরে? মুন্সেফ* এই কথা শুনিয়া বলিলেন — তাঁহার মালার দরকার নাই।

* ইহার নাম রেবতীবাবু। তাহার একটি পা কাটা ছিল, কাঠের সাহায্যে চলিতেন। বাড়ী নবদ্বীপ।

ভূদেববাবুর বাসায় কীর্তনে মা

পরে একদিন নূতন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ভূদেববাবুর বাসায় কীর্তন হয়। এ শরীর যাইবে না বলিয়া ঘরে বসিয়াছিল, নায়েবের স্ত্রী আসিয়া ডাকিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া লইয়া যায়। ভোলানাথের আদেশ ছিল, কেহ বিশেষ করিয়া ডাকিলে যাওয়া। বাহিরের এক খণ্ডে কীর্তন হইতেছে, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট-এর স্ত্রীর সহিত কি কথা বলিতেছি, এমন সময় দেখি কি সর্ব শরীর অবশ হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহার কথা শুনিতে পাইতেছি না। দেখিতেছি সে যেন বহুদূর হইতে কথা বলিতেছে। এ অবস্থায় কোন রকমে যাইয়া বারান্দায় এক চৌকির উপর শুইয়া পড়িলাম। কিছু পরে নেশাখোরের মত অবস্থায় ধীরে ধীরে উঠিলাম এবং নায়েবের খুড়ী আমাকে বাসার দিয়া আসিল।

বাজিতপুরে কালীপূজা

আমাদের সঙ্গে জ্ঞান চক্রবর্ত্তী নামক এক কর্মচারী ও তাহার স্ত্রী অমিয় থাকিত। অমিয় ছেলেমানুষ। আমরা আপন বোনের মত মিলিয়া মিশিয়া ছিলাম। কিছুদিন পরে অমিয় তাহার অন্য বাসায় চলিয়া গেল।

একদিন রাত্রে নাম নিয়া বসিয়াছি, দেখি আপনা হইতে পদ্মাসন হইল। অষ্টগ্রামের মত ভাবাদি একটু প্রকাশ পাইয়া আবার থামিয়া গেল। ইহার মধ্যে ভোলানাথ তাহাদের বার্ষিক কালীপূজা নিজে বাজিতপুরে করিবেন স্থির করিলেন। জিনিষ পত্র কেনা আরম্ভ হইল। চাউল আসিলে আমি তাহা ঝাড়িয়া বাছিয়া একটি নূতন হাঁড়িতে রাখিয়াছি, কোথা হইতে একটি কাক আসিয়া এই চাউলে ঠোক্কর মারিল। সে চাউল ঘরে রাখিয়া, আবার নূতন চাউল আনিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা হইল। বাধা পড়াতে ভোগ রান্না করিতে পারিব না বলিয়া, পূজার দিন অমিয় ভোগ রান্না করিবে স্থির হইল। আমাদের বাসা হইতে এক বাসা পর বাহিরের এক খণ্ডে পূজার স্থান ঠিক হইল। অন্য পুরোহিত না পাওয়ায় স্থানীয় একজন উকিলকে পূজক ঠিক করা হইল। পূজক ভাল তান্ত্রিক ছিলেন।

তিনি বলি ও কারণ ছাড়া পূজা করেন না। অথচ ভোলানাথদের কালীপূজা বংশানুক্রমে সাত্ত্বিক মতে হয়। বিশেষ অনুরোধে তিনি অবশেষে এইরূপ সাত্ত্বিক ভাবেই পূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যার সময় বাবা ও মাখন আসিলেন, রাত্রে পূজা আরম্ভ হইল।

অমিয় ভোগের রান্না করিতেছে, অন্যান্য জিনিষাদি সব তৈয়ার হইয়াছে, কেবল অন্ন বাকি। তখন পূজা প্রায় শেষ করিয়া পূজক ভোলানাথকে বলিলেন — শীঘ্র ভোগ নিয়া আসুন। যজ্ঞেও ভোগের দরকার হইবে। অন্ন বাকি আছে বলিয়া পূজককে বলাতে, তিনি বলিলেন — বেশী রাত্রি হইয়াছে, তবে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিই।

এইদিকে অন্ন নামাইয়া দুইখানি পাথরে অন্ন ও অল্প অল্প প্রত্যেক পদের ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া অমিয় সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। আমি ভোগ রান্নার এক দরজার নিকট দাঁড়াইয়া দেখি — অমিয় লাকড়ীর উপরে চক্ষু বুজিয়া হেলিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এ শরীর দুয়ারে বসিল। এমন ভাবে দরজা বন্ধ হইল যে, কিছু ঘরে ঢুকিলে আমার হাঁটুর উপর দিয়াই যাইতে হইবে। যেখানে আমি বসিয়াছি সেখান হইতে পূজার স্থান একটু দূরেই। মাঝখানে সমানে দুই ঘর, তাহা ছাড়া পর পর পর্দার জন্য দুই বাসার ঘেরা বেড়া। এইসব ব্যবধান সত্ত্বেও মন্ত্রাদি ত স্পষ্ট কানে আসিতেছিল। কিন্তু আমি আগুন সহ যজ্ঞাদি পরিষ্কার রূপে চোখে দেখিতেছিলাম। ইহার ভিতর আরো দেখিলাম কি পূর্ণিমায় পূর্ণ চন্দ্রসহ মধ্য রাত্রিতে আকাশে থাকিলে যেইরূপ হয় সেইরূপ জ্যোৎস্নায় সমস্ত বাড়ী আলোকিত হইয়া গিয়াছে। এ শরীরের গায়েও সে আলো পড়িতেছে। রান্না ঘরের বাতি জ্যোৎস্নার আলোতে অস্পষ্ট দেখাইতেছে। হঠাৎ আমার ডান পাশ হইতে উজ্জ্বল ছায়ার মতন লাল আভাযুক্ত গৌর বরণ পৈতাধারী এক দীর্ঘকায় মূর্তি প্রকাশ হইয়া ঘরের ভিতর দুই পাথরের থালায় যেখানে ভোগ রাখা হইয়াছিল সেখানে বসিল এবং প্রত্যেকটি হইতে মুদ্রায় তিন তিন বার গ্রহণ করিল। আমি বার বার দেখি, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এখান হইতেই — তাহার উৎপত্তি স্থানেই ঐ মূর্তি মিলাইয়া গেল।

ইহার পর ভোলানাথ তাড়াতাড়ি আসিয়া পূজার স্থানে ভোগের ঐ পাথরের থালা দুইখানি দুই হাতে নিয়া চলিলেন। তাঁহার আগে

একজন রাস্তায় গোবর জল ছিটাইতে ছিটাইতে চলিতেছে, পাছে একজনের হাতে লণ্ঠন। সঙ্গে আরও একজন লাঠি হাতে সাথে সাথে যাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে একটি কালো কুকুর আসিয়া লাঠি ইত্যাদি দ্বারা নানা চেষ্টা সত্বেও ভোলানাথকে ছুঁইয়া দিল। ভোলানাথ মহাভাবিত হইয়া, যেখানে কুকুরে ছুঁইয়াছে সেখানে একটি আম গাছ ছিল, তাহারই তলায় পাথর দুইখানি ফেলিয়া পুকুরে স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি বাসায় আসিয়া বলিল — শীঘ্র আবার অন্ন পাক করাও কুকুরে ভোগ নষ্ট করিয়াছে। আমি বলিলাম, বাজার হইতে আতপ চাউল আনাইতে হয়, তাহা না হইলে ঐ দিন যে কাকে ঠোকর দিয়াছিল, তাহা ছাড়া ঘরে অন্য চাউল নাই। এত রাত্রিতে আবার বাজার যাইয়া চাউল আনিয়া ভোগ রান্নার সময় থাকিবে না। ভোলানাথ নিরুপায় দেখিয়া বলিল, ঐ কাকের ঠোকর দেওয়া চাউলই কালী মায়ের ইচ্ছা, তাহা না হইলে এইরূপ ঘটিবে কেন? কোথায় ঐ চাউল? শীঘ্র ভোগের আয়োজন কর, সময় খুব কম। তাহাই রান্না করা হইল। পাক হইলে ভোগের জন্য পাথর তালাস হইল। ভোলানাথ দৌড়াইয়া আমগাছের তলায় যাইয়া দেখিল পূর্বের ভোগ কিছুতে খায় নাই, অমনি পড়িয়া আছে। কি করিবেন দিশা না পাইয়া পুকুরের জলে তাহা ফেলিয়া পাথর দুইখানি ধুইয়া আবার স্নান করিয়া ভোগ লাগাইয়া অতি সাবধানে নিয়া কালীর সম্মুখে নিবেদন করিলেন।

পরে প্রসাদ নিবার সময়, আমি ভোলানাথকে পূর্বোক্ত ঘটনা জানাইলাম এবং পূজককেও জানাইতে বলিলাম। পূজক শুনিবামাত্র অতি ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন — ঐ ভোগ কোথায়? আমি ঐ ভোগ নিব, ঐ আসল ভোগ হইয়াছে। কুকুরে ছুঁইয়া থাকিলেও নষ্ট হয় নাই। পরের ভোগ বাহ্যিক হইয়াছে মাত্র। ভোগ জলে দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন। আরও বলিলেন — ঐ মহাপ্রসাদ পাওয়ার অধিকারীও ত চাই। অনধিকারীতে ত আর উহা পাইতে পারে না। এই ভোগ ত কেহ পাইবার অধিকারী নয় কাজেই এইরূপ হইল। এই সব কথা যখন জানাজানি হইল, কেহ কেহ হাসিয়া উড়াইল, কারণ পূর্বে কীর্তন সম্বন্ধেও এ শরীর নিয়া আলোচনা হইয়াছে।

কাজের খেয়াল ও তাহার উপায়

একবার খেয়াল হইল যে আশুর গায়ের একটি পাঞ্জাবী ও মাখনের নিমা, নিজে ছাঁট্‌কাট্ শিখিয়া সেলাই করিয়া দিব। নিকটবর্তী এক স্ত্রীলোকের নিকট শিখিবার জন্য প্রায় দুই দিন গিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আর একদিন গিয়াছি পাঞ্জাবীর ছাঁট একটু ইঙ্গিতে বলিয়া দিল ও বলিল আমি ভাল জানি না। আর একজনের নাম করিল, সে শিখাইবে বলিল। কিন্তু যখন তাহার কাছে গেলাম, সে বলিল আমি জানি না, ও কিছুই দেখাইল না। আমি সেইদিনই বসিয়া নিজে নিজে আন্দাজে পাঞ্জাবী কাটিয়া সেলাই করিলাম। আশুর গায়ে দিয়া দেখি বেশ ঠিকমত হইয়াছে। পরে দেখি যাহার কাছে শিখিতে গিয়াছিলাম, তাহার ছেলের গায়ের জন্য সে যে পাঞ্জাবী করিয়াছে, তাহা ভাল হয় নাই। সেও আমাকে বলিল — আশুর গায়ের পাঞ্জাবী ত দেখি বেশ হইয়াছে। আপনি নিজে জানিয়া আবার শিখিতে চান কেন? তাহাদের ধারণা আমি পূর্বে কিছু কিছু জানিতাম। কেহ বুঝিত না যে কোন কিছু করিবার ভাব আপনা হইতে জাগিলে তাহার উপায়ও আপনা হইতেই সুন্দরভাবে হইয়া যাইত। যখন কাজ করিতাম তখন শরীরের দিকে একেবারেই খেয়াল থাকিত না। একদিন কি উপলক্ষ্যে একটি টুলের উপর উঠিয়াছি, বেকায়দায় পা পড়িতে পড়িয়া গেলাম। ব্যথা যে পাইলাম, খেয়াল নাই, সে কাজ করিয়া আসিলাম। দুই তিন দিন পরে কাপড় পরিতে গিয়া দেখি হাঁটু হইতে উরু পর্যন্ত একটা দিক সমানে নীলবর্ণ দাগ হইয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানটি যেন অসাড় বোধ হইল। পরে আপনা আপনিই সারিয়া গেল। কাহাকেও জানাইবার খেয়ালই হইল না।

একবার আশুর খুব জ্বর ও রক্ত আমাশয় হয়। ভোলানাথ সামান্য কিছুতেই ভয় পাইতেন, প্রাণও কোমল। এইরূপ অসুখ দেখিয়া তাঁহার কাঁদ কাঁদ ভাব। আমি বলিলাম — সেবার দরকার, কাঁদিলে কি হইবে? তিনি হয়ত মনে করিলেন ইহার মায়া মমতা নাই, না হয় পরের ছেলে। ইতিমধ্যে তাঁহাকে মফঃস্বল যাইতে হইল। এ শরীর একা আশুকে নিয়া দিনরাত্র সেবায়। খেয়াল হইত সর্বদা বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে সে বাঁচিবে না। রাত্রি

জাগিয়া তাহাকে বাহিরে নিয়া বাহ্যি প্রস্রাবাদি করাইতে হইত। আশুর বয়স তখন ১২/১৩ বৎসর। কিছুদিন বাদে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন — বাজিতপুরে আমাকে সমবয়সী সকলেই প্রায় দিদি বলিত। আর একজন বয়সে আমার অনেক বড়, আদরে সীতা ডাকিত। সে স্ত্রীলোকটি একদিন বলিল — তহুরী ইত্যাদি পাইবার সময় হইয়াছে, এবার অনন্ত চুড়ি গড়াইবেন না? এ শরীর কিছুই খেয়াল করিল না। এ কি বলিতেছেন বলিয়া হাসিয়া উঠিল। সে ভাবিল আমি গোপন করিলাম। সে আমাকে খুব আপনার ভাবিয়া সকল সময়েই আলাপ করিত। সেদিন বৈকালে দেখা হইলে দেখি কি, পূর্বের মত তেমন খোলা সরল ভাব নাই।

এই রূপে কয়দিন গেল। তখন কথায় কথায় ভোলানাথের নিকট শুনিলাম যে এই সময়তে জমিদারী কাছারীতে বৎসরের হিসাবনিকাশ হয় এবং কর্মচারীরা তহুরী ও মামুলী পাইয়া থাকে। তাই স্ত্রীলোকটি ঐরূপ বলিয়াছিল। তাহার পরদিন ভোলানাথের ইচ্ছানুযায়ী এ শরীর যাইয়া তাহাকে জানাইল যে এ শরীর এইসব কোন খবরই রাখে না। তাহার কথার প্রত্যুত্তরে বোধ হইল আমি ঘরের মানুষ আমি জানি না, ইহা অসম্ভব। এ শরীর চুপ করিয়া চলিয়া আসিল। বেশ দুনিয়ার খেলা। এইরূপে অনেকে সত্য কি বুঝিতে না পারিয়া ভুলের ভিতর দিয়া মিছামিছি দুঃখ পায়। ইহাই ত অবিদ্যা মায়া।

ইহার পর সে তাহার নিজ দেশে গেল। সে প্রতিবার দেশে যাইতে এ শরীরের সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। কিন্তু এইবার যায় নাই। দেশে গিয়া কাহারও বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করিতে ভয় পায়। পরে মাথাও বিকৃত। তাহার স্বামী ছুটি ফুরাইলে বাজিতপুরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার স্ত্রীর অবস্থা ভোলানাথকে জানাইল যাহাতে সে সরিয়া যায়। এ শরীর শুনিল। তাহার সম্বন্ধে এ শরীরের খেয়াল হইলে কিছুদিন পর তাহার রোগ বিনা চিকিৎসায় সারিয়া গেল।

অক্ষয় নামে এক চাকর কাছারী ও কর্মচারীদের বাসায় কাজ করিত। বাসায় কাজ করিবার জন্য সে থাকিত। ছেলেটি শান্ত ও ভক্ত। যত বেলাই হউক সে পূজা না করিয়া খাইত না। এ শরীর

কুশিতে আসনাদি বানাইতে পারে দেখিয়া সে একদিন বিশেষ বিনয়ের সহিত বলিল যে আমাকে হরি কীর্তনের জন্য একখানি আসন বানাইয়া দিবেন মা ঠাকরুণ? ভোলানাথের কথামত সে গুলিসূতা আনিয়া দিলে তাহাকে একখানি আসন তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ দেখিয়া বলিল — এ কেমন, চাকরকে আসন বানাইয়া দেওয়া হয়? এ লোকটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ভূদেববাবুর বাসায়ও ছিল। আমি ঢাকা থাকিতে ভূদেববাবুর বাসায় একদিন বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঐ আসনের মত একটি আসন তথায় দেখিলাম। শুনিলাম অক্ষয় সেই আসনটি ভূদেববাবুকে দিয়াছিল।

বাজিতপুরে ভোলানাথের সকলের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। একদিন কাছারীর এক ভদ্রলোক, তথাকার মুন্সেফ, উকিল হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারী কাছারীর আমলা ইত্যাদিকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিল। এ শরীরের উপর রান্না করার ভার পড়িল। প্রায় ২৫০ লোক। সেদিন একা এত লোকের পাক যে কেমন করিয়া এত অল্প সময়ে হইল ইহাও অস্বাভাবিক, লোকেরাও বলাবলি করিতে লাগিল। পোলাও ও নানা পদের রান্না এত বেশী পরিমাণে সেইদিনই এ শরীরের প্রথম।

১২।১৩ বছরের একটি মেয়ে, নাম সরলা। দুইবেলা আসিয়া ঠিকা মাহিনায় আমাদের ও অন্য বাসায় কাজ করিত। মাঝে মাঝে ভাল খাওয়া দাওয়া হইলে তাহাকে খাইতে বলিতাম, পূজার সময় কাপড় চোপড়ও তাহার পছন্দ মত পাইত। বাসনাদি ভাল মাজা না হইলে আমি নিজে আবার পরিষ্কার করিতাম। এ কারণে সে আমার কাজগুলি খুব মন লাগাইয়া করিত। হাসিতে হাসিতে বলিত, আপনি মুখে কিছু বলেন না বটে কিন্তু কাজ করাইয়া নেন। অন্যেরা মুখে বলে কিন্তু আমি চুপ করিয়া সরিয়া পড়ি। আপনার কাছে তাহা পারি না। কেহ কেহ বলিত আশুর খুড়ীর বাসন তুই এত পরিষ্কার করিস, আমরা কি তোকে পয়সা দিই না?

ভোলানাথের কুকুর পোষা

ভোলানাথ একদিন একটি সুন্দর সাদা কুকুরের বাচ্চা আনিল। ক্রমে ক্রমে এটি বাসার চৌকিদার হইয়া উঠিয়াছিল। একবার

ইহার পেটের অসুখ হয়, রাত্রে যতবার বাহ্য পাইত, সে মানুষের মত প্রকাশ করিত ও তাহাকে বাহিরে নিয়া পায়খানা করাইয়া আবার ভিতরে লইয়া আসিতাম। ৩।৪ দিন এ অসুখ ছিল। ইহার ভাবভঙ্গী কতকটা মানব শিশুর মত ছিল। নিজের খাওয়ার সময় হইলে ডাকিত, এ শরীর কাছে গেলে চুপ করিত। যখন একটু বড় হইল দেখিতাম সকলের খাওয়া না হইলে আড়ালে বসিয়া থাকিত। খাওয়া শেষ হইল কিনা চুপি দিয়া দেখিত।

পিতা ও ভোলানাথের রোগারোগ্য

এক সময়ে বাজিতপুরে ভীষণ কলেরা দেখা দেয়। ভোলানাথও সে রোগে আক্রান্ত হন। বাড়ীতে কেহই নাই আমি একা। তাহার প্রস্রাব বন্ধ। অবস্থা খুব খারাপ। হঠাৎ খেয়াল হইল যে যদি এ শরীরের বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখটি মরিয়া যায়, তাহা হইলে ভোলানাথ ভাল হইয়া উঠিবে। বলিলাম — তাহাই হউক। ধীরে ধীরে ভোলানাথ ভাল হইতে লাগিল। এদিকে নখটি ক্রমশঃ মরিয়া গেল।

একদিন সকাল বেলা আপনভাবে বসিয়া আছি, দেখি কি শরীরের পিতা কোন একস্থানে হাঁপানিতে সাংঘাতিক অবস্থা। শ্বাস পড়ে না, মৃতের মত। হাঁপানির ব্যারাম তাঁহার বরাবরই ছিল, এই শরীরটা উঠিয়া গিয়া ভোলানাথকে ওই ঘটনার কথা জানাইল। তিনি বলিলেন — যাহাতে ভাল হয়, তুমি দেখ। ঐ সময়ে কতদিন পর্যন্ত ভোলানাথ যাহা বলিতেন, তাহাই পালন করিতে চেষ্টা করিতাম। যাহা হইত না, তাহা কাতরভাবে বলিতাম যে হইতেছে না। তিনিও এতদিন পর্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া এ শরীরের ভাব ও অবস্থা বুঝিতে পারিতেন।

সেদিন আবার যখন স্থির হইয়া বসিয়া আছি দেখি কি আমি যেন পিতা যেখানে আছেন সেইখানে যাইয়া তাঁহার রক্ষার জন্য কিছু দিলাম। আর ভিতর হইতে বাহির হইল — ইনি এইবার বাঁচিলেন। কিন্তু পরে কি ব্যারামে, কি ভাবে শরীর ছাড়িবেন, তাহাও ভিতর হইতে আসিল। পরে বাবার সঙ্গে দেখা হইলে জানিলাম, বাস্তবিকই ঐ সময়ে কসবায় হাঁপানিতে তাঁহার অবস্থা নিতান্ত খারাপ হয়। কে একজন আসিয়া একটি কবচের কথা বলিয়া যায়। সে কবচ ধারণ করিয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

এক সাধুর পরিবর্তন

এ শরীরের কথা বন্ধের কয়েক মাস পরে এক সাধু তথাকার উকিল পাড়ায় আসিয়াছিল। ভোলানাথ তাহাকে এ শরীরের কথা বলাতে সে দেখিতে চাহিল। আমি শুনিয়া বলিলাম দেখ কি হয়। তাহার যদি একান্ত ইচ্ছা হয় তবে আসিতে পারে। পরে জানা গেল যে সে সাধুর সঙ্গ করা উচিত নয়।

একদিন সন্ধ্যায় সে আসিল। ভোলানাথ তাহাকে চৌকির উপর বসাইল। আমি নিত্য যেখানে বসি সেখানে আপনভাবে স্থির হইয়া বসিয়া আছি। ভোলানাথ বলিল — সাধু তোমার সঙ্গে কথা বলিতে চায়। ইশারায় সম্মতি জানাইলাম। কখন কখন ভোলানাথের সঙ্গেও এরূপভাবে কথা বুঝাইতাম। আমি উত্তরমুখী হইতে পূর্বমুখী হইয়া বসিলাম। সাধু নিজের কত কি জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এখানে কুণ্ডলীও হয় না, তাহার কথার জবাবও বাহির হয় না। কিছু সময় এইভাবে কাটিয়া গেলে সে আবার বলিল — আমার কমলা ও বগলা সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। তখন দেখি এ শরীরের ভিতর হইতে সংস্কৃত মন্ত্রাদি বাহির হইয়া মাটিতে কুণ্ডলী দিয়া বসিলাম আর সাধুর দিকে তীব্র দৃষ্টির সহিত আমার মুখ হইতে জোরে বাহির হইল — তুই কী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিস ? ওরে ! তুই কী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিস ? তুই ভণ্ডামী, চুরি, বাজে তাবিজ দিয়া পয়সা নিস্। এই প্রকার আরো তাহার অনেক গুহ্য গোপনীয় কথা এ শরীরের মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল। এই সব শুনিয়া আশে পাশের লোক ২।৪ জন আসিয়া পড়িল। সাধু ত অবাক। সে ভীত হইয়া ঘরের দরজা একটু বন্ধ করিয়া চৌকি হইতে মাটিতে নামিয়া হাত জোড় করিয়া, অতি আস্তে আস্তে, ভোলানাথকে বলিল — চুপ, চুপ। আর আমার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া বলিল — আমার অপরাধ হইয়াছে, আমায় ক্ষমা করুন। কি করিয়া সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহা আমায় বলুন। আমার কিছুই হয় নাই।